উনিশ মে'র ঘটনা ক্রম (সংক্ষিপ্তাকারে)

● ভারতের বরাক নদীই বাংলাদেশে সুর্মা ও কুশিয়ারা নদী। এই নদী ভারত-বাংলাদেশকে একসূত্রে গেঁথেছে। সুর্মা উপত্যকায় লেগেছিল ২১ ফেব্রুয়ারির দামাল হাওয়া, বরাক উপত্যকায় লাগল ১৫শে মে'র প্রবল বাতাস।

অসমে বাঙালিদের সংখ্যা বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। একসময় বাংলাভাষাই ছিল এ রাজ্যে ব্রিটিশ সরকার স্বীকৃত প্রধানভাষা। গণভোটে শ্রীহট্টকে পূর্বপাকিস্তানে ঠেলে দেওয়ার পর অহমিয়া ভাষা হয়ে উঠল সংখ্যা গরিষ্ঠের ভাষা। অবশ্য মণিপুরী, আদিবাসী জনগোষ্ঠী ও বাঙালীদের সম্মিলিত সংখ্যা ধরলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে প্রশ্ন উঠে।

● ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের ২১ এবং ২২ এপ্রিল অসম প্রদেশ কংগ্রেস কেবল অসমিয়া ভাষাকে রাজ্যভাষা করার প্রস্তাব গ্রহণ করে। অসমে তখন বিমলা প্রসাদ চালিহা সরকার। বাঙালী জনসমাজ প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠে। প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বাঙালী বিরোধী একাংশের তাণ্ডব নৃত্য শুরু হয়।

প্রতিক্রিয়ারও প্রতিক্রিয়া থাকে। ঐ বছর ২রা জুলাই বরাক উপত্যকার প্রাণকেন্দ্র শিলচরে 'নিখিল আসাম বাংলা ও অন্যান্য অন অসমিয়া ভাষা সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে বাঙালী, মণিপুরী, খাসিয়া, লুসাই, মিজো, রাজবংশী, গারো, ডিমাছা প্রভৃতি নানা অংশের প্রতিনিধিরাও ছিলেন। সম্মেলনে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার দাবী জানানো হয়। কেন্দ্রীয় সরকারকেও উদ্যোগী হতে বলা হয়। এ আবেদন নিষ্ফল প্রতিপন্ন হলো। শুরু হয় ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা-হাঙ্গামা- হামলা।

● ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট, প্রতিবাদে ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হলো। কলকাতায় শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় এর ঢেউ গিয়ে লাগে। পন্ডিত জহর লাল নেহেরুর দূত হয়ে অসমে এলেন গোবিন্দ বল্লভ পন্থ। তাঁর প্রস্তাব বাংলাভাষার মর্যাদার দাবিতে আন্দোলনরত কমিটি নাকচ করে দেয়। নাকচ হয়ে যায় লালবাহাদুর শাস্ত্রীর দেওয়া ফর্মুলাও। ব্যর্থ হয়ে পন্থজী দিল্লিতে ফিরে গেলেন। ভাষা আন্দোলনকারীদের প্রতিনিধি দিল্লি গিয়ে পরিস্থিতি বোঝাবার চেষ্টা করে বিফল হয়ে ফিরে এলেন।

● ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের ১০ অক্টোবর আসাম বিধান সভায় রাজ্যভাষা বিল পাশ হলো।

বিলে বলা হলো অসমের সরকারি ভাষা অসমিয়া। কেবল কাছাড় জেলায় বাংলা ভাষা সরকারি ভাষার মান্যতা পাবে। বাঙালীরা সমগ্র আসামেই বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাজ্যভাষার স্বীকৃতি দাবি করে।

● ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের ১৫ জানুয়ারি করিমগঞ্জে বাংলা ভাষাকে অন্যতম স্বীকৃত রাজ্যভাষার দাবিতে একটি সম্মেলন হয়। সভাপতিত্ব করেন শীলভদ্রযাজী। পাশাপাশি শিলচরেও সম্মেলন হয়। শিলচর, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি, গোয়াল পাড়া প্রভৃতি নানা স্থানে বাঙালী জনসমাজ মাতৃভাষা বাংলার স্বীকৃতির দাবিতে সোচ্চার হয়। ভাষা আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে।

এই বছর ৫ ফেব্রুয়ারি করিমগঞ্জে রমনীমোহন ইনস্টিটিউটে কাছাড় জেলা ভিত্তিক একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ভাষা আন্দোলনকে সামনে রেখে। সম্মেলনে দাবি উঠলো রাজ্যের অন্যতম স্বীকৃতভাষারূপে বাংলাকে মান্যতা দিতে হবে। অসম সরকারের কাছে দাবিপত্র পাঠানো হলো। জবাবীপত্রের জন্য সময় সীমা বেঁধে দেওয়া হয় ১৩ই এপ্রিল পর্যন্ত। অসম সরকার কোন জবাব দিল না। ভাষা সংগ্রাম পরিষদ বৃহত্তর আন্দোলনের জন্য তৈরী হয়ে গেলো। ছাত্র-যুব সমাজ এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন সর্বস্তরের বাঙালী জনগণ।

● ১৯৬১ সনের ১৮ মে করিমগঞ্জে বিশালাকার শোভাযাত্রা বেরোয়। সরকার পক্ষ বরাক উপত্যকায় ১৪৪ ধারা জারি করে। রাস্তায় রাস্তায় মিলিটারী নামে। পুলিশতো আগেই নেমেছে। ভয় ভীতি সৃষ্টির চেষ্টা হলো সরকারি তরফে। ১৮ই মে ভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতা রথীন্দ্রনাথ সেন, নলিনীকান্ত দাস এবং নিশীথরঞ্জন দাসকে গ্রেপ্তার করা হয়। ফলে অগ্নিতে ঘৃতাহুতির মতো অবস্থা হলো।

● ১৯ শে মে, ১৯৬১ সন। বাংলা ভাষার স্বীকৃতির দাবিতে গড়া মাতৃভাষা সংগ্রাম সমিতি এদিন ভোর ৪টা থেকে ২৪ ঘন্টা হরতালের ডাক দেয়। বলা হলো, দোকান পাট, স্কুল কলেজ, অফিস আদালত, রেল সহ অন্যান্য যানবাহন এমনকি বিমান যাত্রাও এদিন বন্ধ থাকবে। সর্বাত্মক হরতালের ডাকে সরকার পক্ষ কঠোর মনোভাব নিল। ধর্মঘটীরাও সিদ্ধান্তে অবিচল। শিলচর, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি, পাথরকান্দি, বদরপুর সহ নানা জায়গায় পিকেটিং শুরু হয়। করিমগঞ্জ রেল স্টেশনে পিকেটারদের উপর লাঠিচার্জ শুরু হয় ভোর বেলায়। বহু নারী -পুরুষ পিকেটার রক্তাক্ত হন।

● শিলচর রেলস্টেশনেও ভোর ৪টার আগেই পিকেটারগণ রেল লাইনের দখল নিয়ে নেন। বেলা ২টার পর হঠাৎ বিনা প্ররোচনায় পুলিশ ও মিলিটারী একযোগে লাঠিচার্জ, টিয়ারগ্যাস ও গুলি বর্ষণ শুরু করে। সন্ত্রাসের মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনকে স্তব্ধ করার

এই হীনচক্রান্তের বলি হন একাদশ দধিচী। তাঁদের মধ্যে আছেন এক অগ্নিকন্যাও। নাম তাঁর কমলা ভট্টাচার্য। ইনি বিশ্বের প্রথম মহিলা ভাষা শহিদ। যে কোন স্বৈরাচারী শক্তিকে এক সময় পরাভূত হতেই হয়। ইতিহাস বারবার এর প্রমাণ দিয়েছে। অতঃপর বাংলাভাষা অসমের অন্যতম সরকারি ভাষার স্বীকৃতি লাভ করে।

উনিশে মে'র ভাষা শহিদ পরিচিতি
(সংক্ষিপ্ত পরিচিতি)

ভাষা শহিদ কমলা ভট্টাচার্য

ভাষাশহীদ কমলা ভট্টাচার্য ১৯৪৫ সনে শ্রী হট্ট জেলার দক্ষিণ আমুড়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনিই বিশ্বের প্রথম মহিলা ভাষা শহিদ। তার পিতার নাম রামরমণ ভট্টাচার্য। মাতার নাম সুপ্রভাসিনী দেবী। কমলা ভট্টাচার্যরা চার বোন, দুই ভাই। তাঁর ছোট বোন মঙ্গল ভট্টাচার্য ভাষা আন্দোলনে তাঁর সঙ্গে তারাপুর রেলস্টেশনে সত্যাগ্রহে অংশ নিয়ে আহত হয়েছিলেন। অল্প বয়সেই কমলা ভট্টাচার্য পিতৃহারা হন। পিতার মৃত্যুর পর বড় ভাই রমেন্দ্র ভট্টাচার্যের সঙ্গে শিলচরের বিলপাড় লোচন বৈরাগী রোডের পেদাপট্টিতে ছিলেন। সঙ্গে মাও ছিলেন। দেশ ভাগ হবার পর সিলেট থেকে সুপ্রভাসিনীদেবী পুত্র কন্যাদের শিলচরে চলে আসেন (১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে)। ১৯শে মে কেবল কমলা ও মঙ্গলাই নয়, ছোট ভাই বকুল, বোনপো হেমন্তও রেল অবরোধে অংশ নিয়েছিলেন। কমলা ভট্টাচার্য শিলচরের গভর্ণম্যান্ট হাইস্কুলে পড়তেন। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছিলেন। ১৯শে শহীদ হবার পর জানা যায় তিনি ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। পুলিশের গুলি তাঁর মাথায় লেগেছিল। শহিদ হবার পর তার বাসগৃহের সম্মুখস্থ পেদাপট্টি শহিদ কমলা রোড নামে নামাঙ্কিত হয়। ১৬বছর বয়সে কমলা ভট্টাচার্য শহিদ হয়েছিলেন।

ভাষাশহিদ হীতেশ বিশ্বাস

১৩৪৩ বঙ্গাব্দের ২০ মাঘ (১৯৩৬) হীতেশ বিশ্বাস (ফটীক) শ্রীহট্টের হরিগঞ্জের ব্রাহ্মডোরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হরিশচন্দ্র বিশ্বাস। মায়ের নাম কিরণবালা বিশ্বাস। হীতেশরা দুই ভাই, দুই বোন। পিতা চাকরী করতেন ডাক ও তার বিভাগে। ১২ বছর বয়সে হীতেশ বিশ্বাস পিতৃহারা হন। দেশ ভাগের পর হীতেশরা স্বপরিবারে ত্রিপুরার খোয়াই শহর সংলগ্ন উদ্বাস্তু কলোনীতে ঘর বাঁধেন। হীতেশের দিদি বাসন্তীদেবীর বিয়ে হয় শিলচরের অম্বিকা পট্টিবাসী গজেন্দ্র করের সঙ্গে। হীতেশ রুটি-রুজির সন্ধানে ভগ্নিপতির কাছে চলে গেলেন। হীতেশ বিশ্বাস জানিগঞ্জের শ্রীদুর্গা স্টোর্সে চাকরি নেন। চাকুরি সূত্রে হীতেশ দোকান মালিকের বাড়িতেই থাকতে শুরু করেন। ১৯মে হীতেশ বিশ্বাস ভাষা আন্দোলনের কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে রেলস্টেশনের

যান। সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দেন। এই সময় তাঁর বিয়ের কথা চলছিল। সেটা আর হলো না। পুলিশের গুলিতে শহিদ হলেন তিনি। অম্বিকা পট্টির টিকরবস্তি রোড তাঁর নামে হলো শহিদ হীতেশ বিশ্বাস রোড। ২৪ বছর বয়সে তিনি শহিদ হন।

শহিদ চন্ডীচরণ সূত্রধর

১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের সিলেটের হরিগঞ্জ মহকুমাস্থিত উচাইলে মতান্তরে জাকরপুর গ্রামে চন্ডীচরণ সূত্রধর জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম চিন্তাহরণ সূত্রধর। যাঁর চিন্তা হরণ করার কথা তাঁকেই দারিদ্র্যের জ্বালায় দুশ্চিন্তায় থাকতে হতো। কাঠমিস্ত্রি চিন্তাহরণ সূত্রধরের অকাল জীবনাবসানে পরিবারটি আরো বেশি করে অর্থকষ্টে পড়ে। চন্ডীচরণ এম ই ক্লাশ পর্যন্ত পড়ে পাশ করেন। এর মধ্যে মায়ের মৃত্যু হয়। দেশভাগের পর তাঁরা শিলচরে এসেছিলেন মামা সুরেন্দ্র সূত্রধরের সঙ্গে (১৯৫০ খ্রিঃ)। থাকতেন শিলচরের রাঙিরখাড়িতে। কাঠমিস্ত্রির কাজ করতেন। তাঁরা দুই ভাই। একভাই সিলেটেই থেকে যান। মাতৃভাষা আন্দোলনে চন্ডিচরণ সূত্রধর যোগ দিয়েছিলেন। ১৯ মে শিলচর রেলস্টেশনে পিকেটিং এ অংশ নেন। পুলিশের গুলি তাঁর বুকে এসে লাগে। ২২ বছর বয়সে তিনি ভাষা শহিদ হন। রাঙিয়া খাড়ির নতুন গলিটি তাঁর স্মরণে শহিদ চন্ডীচরণ রোড নামাঙ্কিত হয়েছে।

ভাষাশহিদ সুনীল সরকার

১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে তথা ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের পৌষমাসে ঢাকা জেলার মুন্সিগঞ্জ মহকুমার কামারহাটস্থিত মতান্তরে কুমার পাড়ার স্বর্ণগ্রামে সুনিল সরকার জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম সুরেন্দ্র দে সরকার। মায়ের নাম সুভাষিনী দে সরকার। লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো এই যে, পারিবারিক দিক থেকে সুনীল সরকারের পদবী দে সরকারই ছিলো। কিন্তু ভাষা সংগ্রাম পরিষদে তিনি সুনীল সরকার নামে স্বাক্ষর করেছিলেন বলে এখানে তাঁর নাম সুনীল সরকারই লেখা হলো। শিলচরে তিনি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর পেশা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা চার ভাই তিন বোন। দেশভাগের বলি হয়ে তাঁরা ১৯৪৭ সনে শিলচরে চলে আসেন। বাসা করেন নতুন পট্টিতে। পরে চলে যান হাসপাতাল রোডে। তিনি নরসিংহ হাইস্কুলে পড়াশোনা করেছেন। ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ে স্কুলের পাট চুকিয়ে একটি ছোট দোকান করেন (সেন্ট্রালরোডে)। ১৯ মে রেলস্টেশনে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগদিয়ে পুলিশের গুলিতে শহিদ হন। গুলি এসে কপালে লেগেছিল। হাসপাতাল রোড ও শ্মশান রোডের সংযোগকারী রোডটি তাঁর স্মৃতিতে সুনীল সরকার রোড হয়েছে। ২২ বছর বয়সে তিনি মাতৃভাষা সংগ্রামে আত্মবলিদানে অমর হলেন।

ভাষা শহিদ কানাইলাল নিয়োগী

১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ১লা জানুয়ারি তদানিন্তন পূর্ববাংলার ময়মন সিংহ জেলার

টাঙ্গাইল মহকুমাস্থিত কালিহাতি থানাধীন খিলদা গ্রামে কানাইলাল নিয়োগীর জন্ম। ভাষা শহিদ কানাইলাল নিয়োগীর বাবার নাম দ্বিজেন্দ্রলাল গুহ নিয়োগী। মায়ের নাম মনোরমা গুহনিয়োগী। কানাইলাল নিয়োগী পদবী লিখতেন। তাঁরা তিন ভাই ও সাত বোন। কানাইলাল নিয়োগীর স্ত্রীর নাম শান্তিকণা দেবী। তাঁর দুই পুত্র ও দুই কন্যা। তিনি ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ করেন। পরে রেল বিভাগে চাকরী পান। দেশভাগের পর চলে এলেন শিলচরে। শিলচরে রেলে পার্সেল ক্লার্কের কাজ পান (১৯৬১ সনে)। থাকতেন রেল কোয়ার্টারে। কানাইলাল নিয়োগী ছিলেন রেলওয়ে এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের আসাম স্টেট কমিটির সেক্রেটারী। সত্যাগ্রহীদের সাহায্য করতে গিয়ে তিনি গুলিবিদ্ধ হয়ে শহিদ হন। শিলচর রেল স্টেশন রোড ও মাদার টেরেসা রোডের সংযোগস্থাপনকারী রাস্তাটি তাঁর নামে উৎসর্গীত হয়। তিনি ৩৮ বছর বয়সে শহিদ হন।

ভাষাশহিদ শচীন্দ্র পাল

১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ১৯ আশ্বিনে শিলচরে তাঁর জন্ম। বাবার নাম গোপাল চন্দ্র পাল। তাঁর নামেই শিলচরের একটি বাণিজ্য কেন্দ্রের নাম হয়েছে গোপাল গঞ্জ। পূর্ব পাকিস্তানের সিলেট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমার চন্দনপুর গ্রামে ছিল তাঁর আদি নিবাস। শচীন্দ্রপালের মায়ের নাম সুবর্ণপ্রভা পাল। তাঁরা পাঁচ ভাই এক বোন। তিনি নাজিরপট্টি মডেল প্রাইমারী স্কুলে পড়াশোনা করেছেন। তারপর পড়েছেন কাছাড় হাইস্কুলে। ১৭ই মে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে ছুটে যান শিলচর রেলস্টেশনে। লক্ষ্য সত্যাগ্রহে যোগ দেবেন। তার আগে ভোরে বাড়ির গুরুজনেরা ধান-দুর্বা চন্দনের ফোটা দিয়ে তাঁকে ও তাঁর বন্ধুদের আশীর্বাদ করেন। রেলস্টেশনে গিয়ে দেখেন কাঁদানে গ্যাসে অনেকেই চোখে দেখছেন না। লাঠিচার্জে ক্ষত-বিক্ষত। বেলা ২-৩৫ মিনিটে গুলি চললো। শচীন্দ্র পালের পেটে গুলি লাগলো। তাঁকে সতীন্দ্রমোহন দেবের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। কারণ ওখানে অস্থায়ীভাবেব রেডক্রসের শিবির গড়া হয়েছিলো। তাঁকে বাঁচানো যায়নি। তার মৃত্যুর পর জানা যায়, তিনি ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ করেছেন। শিলচরের দেওয়ানজী বাজার রোড পরে শহিদ শচীন্দ্রপাল রোড নামে পরিচিত হয়। শচীন্দ্রপাল ১৯ বছর বয়সে শহিদ হন।

শহিদ বীরেন্দ্র সূত্রধর

১৯-এর ভাষা শহিদ বীরেন্দ্র সূত্রধর ১৯৩৭ সনের সেপ্টেম্বর মাসে সিলেটের নবীগঞ্জ থানাধীন বহরমপুরে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম নীলমণি সূত্রধর। মায়ের নাম জানা যায়নি। অল্প বয়সে পিতৃ-মাতৃহীন বীরেন্দ্র সূত্রধর ৭ম শ্রেণির পর আর পড়াশোনা করতে পারেননি। তিনি কাঠমিস্ত্রির কাজে লেগে গেলেন। দেশভাগের পর

উদ্বাস্তু হয়ে শিলচরে চলে আসেন। তিনি শিলচরে ধনকুমারী দেবীর সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন (১৯৫৯ সনে)। সন্তান সম্ভবা স্ত্রীকে ত্রিপুরার ধর্মনগরে ভাই এর বাড়িতে রেখে শিলচরে ফিরে যান। ধর্মনগরে তাঁর একটি কন্যা সন্তান জন্মে। মেয়ের নাম রানি। ১৯৬১ সনের কথা, বীরেন্দ্র সূত্রধর তাঁর স্ত্রী ও মেয়েকে হাইলাকান্দির মণিপুরী বাগান এলাকায় কাকার কাছে রেখে আইজলে মিস্ত্রির কাজে চলে যান। মেয়ের অসুস্থ হবার খবর পেয়ে ১৭ই মে শিলচরে এলেন। শুনলেন ১৯ মে ভাষা আন্দোলনকারীগণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে তীব্র করে তুলবেন। ১৯ মে ছুটে যান তারাপুর রেলস্টেশনে। সত্যাগ্রহী বীরেন্দ্র সূত্রধর পুলিশের গুলিতে লুটিয়ে পড়েন। গুলি তাঁর বুকে লাগে। সিভিল হাসপাতালে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। তখন স্ত্রীর বয়স মাত্র ১৭ বছর। বীরেন্দ্র সূত্রধর ২৪ বছর বয়সে শহিদ হয়েছিলেন। মালুগ্রাম কালীবাড়ি থেকে যে রাস্তাটি শিববাড়ি পর্যন্ত চলে গেছে, সেই রাস্তা তাঁর স্মৃতিতে শহিদ বীরেন্দ্র সূত্রধর রোড হয়েছে।

ভাষা শহিদ সত্যেন্দ্র দেব

১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে শ্রীহট্টের হবিগঞ্জ জেলার দেওন্দিগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম শশীমোহন দেব। মায়ের নাম সুরবালা দেব। দেশভাগের বলি হয়ে পিতা শশীমোহন দেব সপরিবারে ত্রিপুরার কৈলাসহর মহকুমাস্থিত ফটিকরায়ের রাজনগর কলোনীতে বাড়ি করেন। পিতার অকাল মৃত্যুতে পড়াশোনা প্রাথমিক শ্রেণির বেশি এগুতে পারেনি। মা ও তিনবোনের দায়িত্ব নিয়ে তিনি কাজের সন্ধানে শিলচরে যান। এখানে রাজমিস্ত্রির কাজের পাশাপাশি শ্রীকৃষ্ণ টকিজেও কাজ করতেন। থাকতেন জানিগঞ্জে ফটিক শেঠের বাড়িতে। সেখানেও ফাই ফরমাস খাটতে হতো। ১৯শে মে জানিগঞ্জ, দেওয়ানজী বাজার, গোপালগঞ্জ প্রভৃতি স্থান থেকে সত্যাগ্রহীরা মাতৃভাষা বাংলাকে রাজ্যভাষার স্বীকৃতির দাবিতে যখন রেল স্টেশন মুখী, তখন তিনি এতে যোগ দেন। গুলি চলছে দেখে কাছেই একটি পুকুরে ঝাঁপ দিলেন। পর দিন সকালে তাঁর গুলিবিদ্ধ লাশ পাওয়া গেল। কার্ফ্যু উপেক্ষা করে ২০ মে ৯ জন শহিদের নিষ্প্রাণ দেহ নিয়ে বিশালাকার শোক মিছিলে হাঁটলেন হাজারো মানুষ। শিলচরের পানপট্টি রোড তাঁর স্মৃতি নিয়ে শহিদ সত্যেন্দ্র দেব রোডে নামে পরিচিত হয়। জীবনাবসান কালে সত্যেন্দ্র দেবের বয়স ছিল ২৪ বছর।

ভাষাশহিদ তরণী মোহন দেবনাথ

১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে তদানিন্তন পূর্ব বাংলার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর থানাধীন শ্যামগ্রামে জন্মেছিলেন তরণী মোহন দেবনাথ। পিতার নাম যোগেন্দ্র দেবনাথ এবং মায়ের নাম জগতীবালাদেবী। তরণী দেবনাথেরা দুইভাই। দাঙ্গার কবলে পরে পিতা যোগেন্দ্র দেবনাথ সপরিবারে শিলচরে এসে (১৯৫০) রাঙিরখাড়িঅঞ্চলে বাড়ি করেন এবং বংশগত পেশা সুতোর ব্যবসায় মন দেন। তরণী দেবনাথ প্রথমে পড়েন অম্বিকাপট্টির দুর্গাশঙ্কর

পাঠশালায়। পরে পাবলিক হাইস্কুলে দশম শ্রেণির পর পড়াশোনা আর এগোল না। তরণী দেবনাথ সুতোর ব্যবসা শুরু করতেন দাদা রমণী মোহনের সাথে। রাঙিরখাড়ি বয়ন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা তরণীমোহন দেবনাথ এই সমিতির সম্পাদক হন। ১৯শে মে পিসতুতো ভাই ক্ষেত্রমোহন দেবনাথকে নিয়ে শিলচরস্থিত তারাপুর রেলস্টেশনে রেল অবরোধ কর্মসূচিতে তথা সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দেন। প্রথমে পুলিশের লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাসে আহত তরণী দেবনাথ তারপরেও অবিচল থাকেন। অতঃপর গুলি এসে মাথায় লাগলো। ২০ বছর বয়সে তরণীমোহন দেবনাথ শহিদ হলেন। রাঙিয়াখাড়ির যে রোডের পাশে থাকতেন, সেই রোড শহিদ তরুণী দেবনাথ রোড নামে পরিচিতি পায়।

ভাষাশহিদ কুমুদ রঞ্জন দাস

১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে শ্রীহট্টের মৌলবী বাজার মহকুমার জুরি গ্রামে ভাষা শহিদ কুমুদ রঞ্জন দাসের জন্ম। পিতার নাম কুঞ্জমোহন দাস। শিশুকালেই কুমুদ মাতৃহারা হন। দেশভাগের পর তাঁরা আগরতলা চলে আসেন। কুমুদ দাস এখানে মামা নলিনী মোহন দাসের বাড়িতে আশ্রয় নেন। এখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এম, ই পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। ড্রাইভিং শিখে চলে যান শিলচরে। এখানে তারাপুর একটি চায়ের দোকানেও কাজ করেছেন তিনি। গাড়ির চালকের কাজ শুরু করার আগেই টিস্টলবয় কুমুদ রঞ্জনের সামনে এসে গেল ১৯শে মে'র রক্তক্ষরা দিন। ঐদিন সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দেবার লক্ষ্যে রেলস্টেশনে ছুটে যান। সেখানেই গুলিবিদ্ধ হয়ে ভাষাশহিদ হন কুমুদরঞ্জন দাস। শিলচরের ম্যাগাজিন রোড বর্তমানে শহিদ কুমুদ দাস রোড নামে পরিচিত। শহিদ হওয়ার সময় তাঁর বয়স ছিলো ১৮/১৯।

ভাষা শহিদ সুকোমল পুরকায়স্থ

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে করিমগঞ্জ জেলার বাগবাড়ি গ্রামে সুকোমল পুরকায়স্থের জন্ম। পিতার নাম সঞ্জীব পুরকায়স্থ। মায়ের নাম শৈবালিনী পুরকায়স্থ। তাঁরা তিনভাই, চার বোন। তাঁর স্কুল জীবন শুরু হয় বাবার বড় ভাই (জ্যাঠা) মহেন্দ্র পুরকায়স্থের বাড়ি থেকে। শিলচরের অভয়াচরণ পাঠশালায় তাঁকে ভর্তি করে দেওয়া হয়। জ্যাঠামশাই মহেন্দ্র পুরকায়স্থ হলেন মহীতোষ পুরকায়স্থের পিতা। মহীতোষ পুরকায়স্থ ১৯৬১ সানে শিলচর পুরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি আসাম সরকারের মন্ত্রীপদেও আসীন ছিলেন। শিলচরের নরসিংহ হাইস্কুলে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করে সুকোমল পুরকায়স্থ ব্যবসা করবেন বলে ডিব্রুগড়ে চলে যান। এর মধ্যে খবর পেলেন ছোটবোন মিলি খুব অসুস্থ। তাকে দেখতে তিনি শিলচরেরশ্রীকোনায় এলেন। ১৯মে এখান থেকেই সত্যাগ্রহে যোগ দিতে রেলস্টেশনে চলে যান। এখানে গুলি বিদ্ধ হয়ে শহিদত্ব লাভ

করেন সুকোমল পুরকায়স্থ। শিলচরপুরসভা শ্মশান রোডের নামকরণ করে শহিদ সুকোমল পুরকায়স্থ রোড।

১৯ মে'র পরবর্তীকালে ভাষা শহিদেরা

কৃষ্ণকান্ত বিশ্বাস

১৯৬১'র ১৯মে, শিলচর স্টেশনে সত্যাগ্রহের সময় পুলিশেরগুলিতে আহত হয়েছিলেন কৃষ্ণকান্ত বিশ্বাস। দীর্ঘ একুশ বছর সেই ক্ষত তাঁকে মৃত্যুর পানে নিয়ে গেছে। গুলি লেগেছিল বুকের নিচের অংশে। তাই তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়নি। হাসপাতালে পড়ে ছিলেন দীর্ঘদিন। ১৯৮৬ সনের ২৪শে জুন তিনি চিরনিদ্রায় শায়িত হন। 'সোনার কাছাড়' (১লা জুলাই সংখ্যা ঃ ১৯৮৫) পত্রিকায় লেখা হয়েছে, বন্যার দূষিত জল ঢুকেছিল ক্ষতস্থানে। প্রয়োজনীয় অসুধ কেনারও সাধ্য ছিলো না। অর্থসঙ্কটের ফলে সুচিকিৎসা হয়নি। বেদনা দায়ক পরিস্থিতির ফলে তাঁকে আর বাঁচিয়ে রাখা যায়নি। শহিদপত্নী স্বল্প বয়সী শান্তি বিশ্বাসের কান্না আজো শিলচরের আকাশ বাতাসে ভেসে বেড়ায়। তাঁদের চারপুত্র ও তিন কন্যা।

ভাষা শহিদ বিজন চক্রবর্তী (বাচ্চু)

বিজন চক্রবর্তী ১৯৪৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭২ সনের ভাষা আন্দোলনে শহিদ হন (১৭ আগস্ট)। আদি নিবাস ছিল শ্রীহট্টের পঞ্চখণ্ড গ্রামে। স্বাধীনোত্তর কালে পিতা যোগেশ চক্রবর্তী ও মাতা জুঁই চক্রবর্তী পাঁচটি কন্যা ও পুত্রকে নিয়ে করিমগঞ্জ জেলার পাথার কান্দিতে চলে আসেন। পাথার কান্দি স্কুল থেকেই ম্যাট্রিক পাশ করেন বিজন চক্রবর্তী (১৯৬৮ সনে)। বিজন চক্রবর্তী যখন শহিদ হন তখন তাঁদের বিবাহিত জীবনের মেয়াদ মাত্র ৮ মাস। বিজন চক্রবর্তীর স্ত্রীর নাম মীরা চক্রবর্তী।

১৯৭২ সনের অন্যতম ভাষা শহিদ মণীশ দাশ

পিতা ডাঃ মনীন্দ্র দাশ। মায়ের নাম সুপ্রভা দাশ। মণীন্দ্র দাসের দুই পুত্র, ডাঃ মণীশ দাশ এবং মনোজ কুমার দাশ। তাঁদের আদি নিবাস ছিল শ্রীহট্ট জেলার মৌলবী বাজার। পরে তাঁরা করিমগঞ্জে চলে আসেন। মণীশ দাশ ১৩৫০ বঙ্গাব্দের ২৮ আশ্বিন জন্ম গ্রহণ করেন। ২৯ বছর বয়সে শহীদ হন ১৩৭৯ বঙ্গাব্দে (১৪ অক্টোবর ১৯৭২ইং)।

১৯৮৬ সনে ভাষা সংগ্রামে অপর শহিদ দিব্যেন্দু দাস (যীশু)

পিতা দ্বিজেন্দ্র দাস, মায়ের নাম অর্চনা দাস। দিব্যেন্দুরা তিন ভাই,তিন বোন। বাংলা ভাষার জন্য অসমে অপর শহীদ জগন্ময় দেব ১৯৫১ সনে শ্রীহট্টের হবিগঞ্জ মহকুমার জলশুখায় জন্ম। পিতা যোগেশ চন্দ্র দেব, মা- যোগমায়া দেব। দেশ ভাগের পর তাঁরা করিমগঞ্জে চলে আসেন। তাঁরা চার ভাই, চার বোন।

(সূত্র ঃ নানা গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা)